গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ৬ - ১২ মে, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বিপ্লবী সংগ্রামে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছাত্রযুব বাহিনী চাই

২৪ এপ্রিলের জনসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ২৪ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে কলকাতায় শহীদ মিনার ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস্ অনিল সেন, সুকোমল দাশগুপ্ত, শীতেশ দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস্ মানিক মুখার্জী, সুনীল মুখার্জী, সনৎ দত্ত ও গোপাল কুণ্ডু। এস ইউ সি আই কিশোর বাহিনী 'কমসোমল' সদস্যরা প্রয়াত মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতির প্রতি গার্ড অফ অনার প্রদর্শন করে।

প্রধান বক্তার ভাষণে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আমাদের দেশের ও বিশ্বের শোষিত নিপীড়িত জনগণ বর্তমানে এক ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সম্মুখীন।

আমরা দেখছি, একদিকে সংবাদপত্রের খবরে, রেডিও-টিভির প্রচারে, অন্যদিকে কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএম যে দলই হোক, যে যেখানে সরকারে ছিল বা আছে, প্রত্যেকেই প্রচার করে যাচ্ছে, তারা দেশের কত উন্নয়ন করছে। 'উন্নয়ন', 'সংস্কার' এ কথাগুলি আজকাল বহুল প্রচারিত। অথচ, কার উন্নয়ন হচ্ছে? কী উন্নয়ন হচ্ছে? কী ধরনের সংস্কার হচ্ছে? কী উদ্দেশ্যে সংস্কার হচ্ছে? এর কোনও উত্তর নেই।

আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগে বলেছিলেন, আমাদের মতো একটি শ্রেণীবিভক্ত দেশে 'জাতীয় উন্নয়ন', 'দেশের উন্নয়ন', 'জাতীয় স্বার্থ' এ কথাগুলোর কোন মানে নেই। দেশটা যখন শ্রেণীগতভাবে বিভক্ত, তখন কোন্ শ্রেণীর স্বার্থে 'উন্নয়ন', কোন্ শ্রেণীর স্বার্থে 'সংস্কার' — সেটা বিচার্য।

শোষিতশ্রেণীর স্বার্থে উন্নয়ন বলতে বোঝায় দেশের কোটি কোটি মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক ন্যায্য মজুরিতে স্থায়ী কাজ পাচ্ছে। উন্নয়ন বলতে বোঝায় জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের কেনার সামর্থ্যের মধ্যে আছে, সকল ছেলেমেয়ে শিক্ষার অবাধ সুযোগ পাচ্ছে, মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ আছে, মাথা গোঁজার আশ্রয় আছে। উন্নয়ন বলতে বোঝায় দেশে নারীর নিরাপত্তা আছে, ছাত্র-যুবকদের চরিত্র উন্নত নীতিনৈতিকতার ভিত্তিতে গঠিত হচ্ছে। এই মানদণ্ডে বিচার করলে আজ ভারতবর্ষের চেহারা কী?

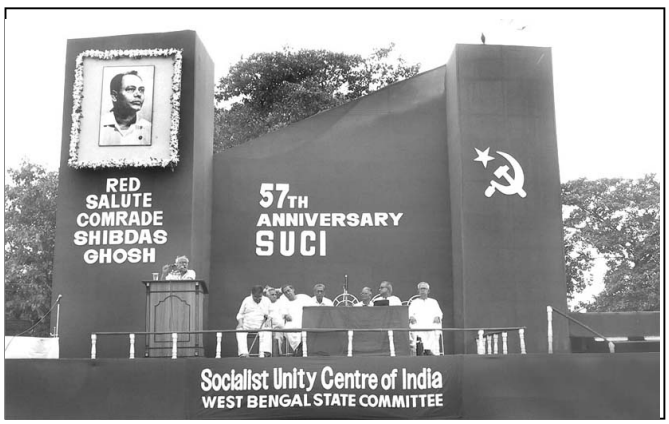

ওরা বলছে, আমাদের দেশে শিল্পায়ন হচ্ছে, শিল্পবিপ্লব হচ্ছে। ইউরোপে যে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে, তা শিল্পকে ক্ষুদ্র কুটিরের গণ্ডি থেকে মুক্ত করে বৃহৎ শিল্পে পরিণত করেছিল, ব্যাপক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছিল, সামন্তী সম্পর্কের বাঁধন থেকে ভূমিদাসদের মুক্ত করে তাদের শিল্পে নিয়োগ করেছিল। সাথে সাথে জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটিয়েছিল, শিক্ষার

চারের পাতায় দেখুন

শ্রমিকের রক্তে রাঙা
মে দিবস

বিশ্বায়নের হাওয়ায়, উন্নয়নের ঢাকঢোলের সোচ্চার আওয়াজের নীচে আজ চাপা পড়ছে শ্রমিকের আর্তনাদ। মে দিবস বর্তমানে ইতিহাস, আট ঘণ্টার শ্রমদিবস সংগ্রামদীপ্ত অতীতের উজ্জ্বল স্মারক।

১৮৬০ নাগাদ ইউরোপের নানা দেশে শুরু হয়েছিল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত বা আরও দীর্ঘ শ্রমদিবসকে আট ঘণ্টায় বেঁধে দেওয়ার দাবিতে সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের ইতিহাসে ১৮৮৬ সালের ১লা মে-র শ্রমিক আন্দোলন একটি মাইল ফলক। আট ঘণ্টার শ্রমদিবসের দাবি নিয়ে লড়াই চলেছিল মে দিবসের পরেও। ১ মে থেকে আন্দোলনের ধারায় ৩ মে শিকাগো-র হে মার্কেটে পুলিশের নির্বিচার গুলিচালনা, ধর্মঘটি শ্রমিকদের রক্তস্রোত, শ্রমিকনেতা পার্সন্স, স্পাইজ, ফিসার ও এঙ্গেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ, বিচারের প্রহসন ও ফাঁসি, আন্দোলনের গতিকে স্তিমিত করতে পারেনি। ১৮৮৬-র পরেও চলেছে আট ঘণ্টার শ্রমদিবসের লড়াই। অবশেষে সেই দাবি আদায় হয়েছিল, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছিল আট ঘণ্টার শ্রমদিবস। সর্বক্ষেত্রে না হলেও সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে ও সরকারি দপ্তর ও কারখানায় আট ঘণ্টার শ্রমদিবস চালু হয়েছিল। কিন্তু আজ সে অধিকার নতুন করে বিপন্ন হয়েছে। সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও চীনের প্রতিবিপ্লবের সুযোগে পুঁজিবাদের একতরফা তীব্র আক্রমণে আট ঘণ্টার শ্রমদিবস আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। আধুনিক প্রযুক্তির আশ্চর্য বিকাশ মালিকের মুনাফাকেই কেবল বাড়িয়েছে, শ্রমিক ও ব্যাপক জনগণের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের বদলে নিয়ে এসেছে ব্যাপকহারে ছাঁটাই, অনাহারের নির্মম অভিশাপ ও কাজের অতিরিক্ত বোঝা। শিল্পমালিকরা এখন প্রকাশ্যেই বলছেন — দশ, বারো ঘণ্টা বা আরও দীর্ঘতর শ্রমদিবস চাই। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার 'স্পেশাল ইকনমিক জোনে', আই টি পার্কে আইন করে ঘণ্টা বাঁধা শ্রমদিবসই তুলে দিয়েছে। মালিকের মুনাফার প্রয়োজন অনুসারে মালিকদের নির্দেশেই নির্ধারিত হচ্ছে শ্রমদিবস। 'উদীয়মান' তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে নির্দিষ্ট শ্রমদিবসের বালাই নেই। বারো, চোদ্দ, ষোল, আঠার ঘণ্টা নাগাড়ে কাজ করছে মানুষ নামক যন্ত্র।

সাতের পাতায় দেখুন

'জীবনশৈলী' শিক্ষার বিরুদ্ধে মহিলাদের বিক্ষোভ

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠশ্রেণী থেকে জীবনশৈলী শিক্ষার নামে যৌনশিক্ষার পাঠক্রম চালু করার যে সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নিয়েছে, অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন শুরু থেকেই তার তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। সুকুমারমতি কিশোর-কিশোরীদের নৈতিকতাবর্জিত মেরুদণ্ডহীন প্রাণীতে পরিণত করে দেবার এই সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে এ আই এম এস এস বহু আলোচনা সভা, সেমিনার এবং পথসভার আয়োজন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৫ এপ্রিল সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিক্ষোভের আগে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে মহিলাদের একটি মিছিল পর্ষদ অফিসে যায়। এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড় বলেন, জীবজগতের বিবর্তনের ধারায় মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে বিকশিত হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব তার মানবিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ন্যায়-নীতি বোধের ধারণায় পরিব্যক্ত হয়েছে, আর এইখানেই অন্যান্য জীবের সাথে মানুষের পার্থক্য। এই মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদী মন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার। এর সাথে যুক্ত থাকে শরীর চর্চা ও খেলাধূলা যা একটি কিশোরকে সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত হতে সাহায্য করে। এরাজ্যে যেখানে প্রয়োজন বিদ্যালয়গুলিতে খেলাধূলার চর্চা, সাহিত্য পাঠ, সংস্কৃতি চর্চার প্রসার। সেখানে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জীবনশৈলী শিক্ষার নামে যৌনশিক্ষার একটি পাঠক্রম চালু করে কিশোর কিশোরীদের বিপথগামী করার পথ নিচ্ছে। আমরা মনে করি, একজন মানুষ শুধুমাত্র কতগুলি জৈবিক ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র নয়। এই জীবনশৈলী শিক্ষার যে শিক্ষা সহায়িকা পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার বিষয়বস্তু ও পরিবেশনা দেখে মনে হয় যে মানুষের জীবনটা শুধুমাত্র যৌনজীবন।

কমরেড হোড় বলেন, আজ সমাজ পরিবেশ যেভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে তাতে ন্যূনতম নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সুস্থ সংস্কৃতিটুকুও ধ্বংস হতে চলেছে। ঢালাও মদের লাইসেন্স, রেডি টু ড্রিঙ্ক নামে সস্তায় সর্বত্র মদের প্যাকেট বিক্রির পরিকল্পনা, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা-ছবি প্রকাশ, গণমাধ্যমে হিংসাপ্রবণ চলচ্চিত্র প্রদর্শন এমনিতেই কিশোর-কিশোরীদের বিকৃত রুচির পথে ঠেলে দিচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিশোরবয়সী ছেলেরা পর্যন্ত ধর্ষণ ও গণধর্ষণের মত ঘৃণ্য অপরাধ মূলক ঘটনায় লিপ্ত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জীবনশৈলী শিক্ষার নামে যৌন শিক্ষাক্রম নিরাপদে যৌন ব্যাভিচারের দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের আরও ঠেলে দেবার এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

কমরেড হোড় ক্ষোভের সাথে বলেন, যেখানে

ছয়ের পাতায় দেখুন

উত্তর ২৪ পরগণা

বসিরহাটে ভ্যাট বিরোধী নাগরিক কনভেনশন

গত ২০ এপ্রিল বসিরহাট টাউন হলে ভ্যাট চালুর প্রতিবাদে এস ইউ সি আই বসিরহাট লোকাল কমিটির উদ্যোগে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক নাগরিক এবং ব্যবসায়ী এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনের প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ ভ্যাটের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভ্যাট চালুর ফলে গরিব ও মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের উপর মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপবে, ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা চালানো কঠিন হয়ে পড়বে, অপরদিকে এর দ্বারা দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের বিপুল কর ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই বসিরহাট লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অজয় বাইন, বসিরহাট মহকুমা ব্যবসায়ী সমন্বয় সমিতির সভাপতি দীপক রায়চৌধুরী এবং সম্পাদক সুভাষ চৌধুরী। সংগ্রামী হকার সমিতির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মনোরঞ্জন শেঠ। সভায় সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই বসিরহাট লোকাল কমিটির অন্যতম সদস্য শিক্ষক নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ ভঞ্জ চৌধুরী। এই কনভেনশন স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

নদীয়া

বিড়ি শিল্পে সঙ্কট ঃ শ্রমিক বিক্ষোভ

২০ এপ্রিল চার শতাধিক বিড়ি শ্রমিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে করিমপুর বিডিও অফিসে বিড়ি শ্রমিকদের চার দফা দাবির ভিত্তিতে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিড়ি শিল্পে মালিক, কনট্রাক্টর এবং সরকারি নীতির ত্রিমুখী আক্রমণে শ্রমিকরা বিপর্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ন্যূনতম বিড়ি মজুরি আইনকে তোয়াক্কা না করে শ্রমিকদের এক হাজার বিড়ি পিছু মাত্র ১৫-২০ টাকা মজুরি দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা আজও অবহেলিত। এই শিল্পে বর্তমানে মহিলা শ্রমিকদেরই প্রাধান্য থাকায় মালিকরা প্রতিবাদ হীনতার সুযোগে বল্গাহীন অত্যাচার শোষণ আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এরই প্রতিবাদে ছিল এই বিক্ষোভ ডেপুটেশন। ডেপুটেশনের এই কর্মসূচীর কথা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃবৃন্দ ১৫ দিন আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলেন। বিডিও নিজে এই ডেপুটেশন গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে পড়লে অবস্থা বেগতিক দেখে যুগ্ম বিডিও এই ডেপুটেশন গ্রহণ করেন।

ডেপুটেশনের আগে বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে শ্রমিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় থানার পাড়া থানা বিড়ি শ্রমিক নেতা কমরেড আব্বাস আলি ও নদীয়া জেলা বিড়ি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের আহ্বায়ক কমরেড প্রবীর দে বক্তব্য রাখেন। কমরেড দে বলেন, বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমদপ্তর দ্বারা গঠিত বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ সংগঠনের দেওয়া পরিচয়পত্র প্রকৃত শ্রমিকরা পাচ্ছেন না, সেখানেও নানা দুর্নীতি স্বজন-পোষণ চলছে। এই সংগঠনের দেওয়া বিড়ি শ্রমিকদের নানান সুযোগ সুবিধা থেকে প্রকৃত শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। তিনি অভিযোগ করেন বর্তমানে এই সংগঠনকে বেসরকারীকরণের চক্রান্ত চলছে। বিড়ি শিল্পে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ এবং আধুনিকীকরণের চেষ্টা চলছে। তার ফলে এক ধাক্কায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারাবেন। সরকারি এই নীতির বিরুদ্ধে তিনি শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলনের আহ্বান জানান। পরে ৭ জনের এক প্রতিনিধি দল যুগ্ম বিডিও'র হাতে স্মারকলিপি তুলে দেয়। যুগ্ম বিডিও পরিচয়পত্র দেওয়ার বিষয়ে তাঁর দপ্তর থেকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিলে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন।

বীরভূম

ফি বৃদ্ধি ও ভর্তি সমস্যা সমাধানের দাবিতে ডি আই অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন

এ আই ডি এস ও বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে পঞ্চম, নবম ও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি সমস্যার সমাধান, সরকার নির্ধারিত ফি'র বাড়তি ফি আদায় বন্ধ করা, ভর্তির সময় ডোনেশন আদায় বন্ধ করা, প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন না করা, এস সি/এস টি ছাত্রদের নিয়মিত বৃত্তিপ্রদান সহ বিভিন্ন দাবিতে বীরভূম জেলা স্কুল পরিদর্শককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শতাধিক ছাত্রছাত্রীর দৃপ্ত মিছিল জেলা শহর সিউড়ীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জেলা পরিদর্শক অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমরেড আয়েষা খাতুন, বিজয় দলুই প্রমুখ জেলা নেতৃবৃন্দ। জেলা স্কুল পরিদর্শক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে এক সপ্তাহের মধ্যে জেলার প্রতিটি স্কুলে বাড়তি ফি ও ডোনেশন আদায় বন্ধ করার জন্য সার্কুলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, এবং ভবিষ্যতে ভর্তি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

মুর্শিদাবাদ

মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ

১৯৯৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর হরিহরপাড়া থানায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও, থানার ওসি, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও বিড়ি মালিকদের উপস্থিতিতে যে মজুরিচুক্তি হয়েছিল, বিড়ি মালিকরা সেই অনুযায়ী মজুরি দিচ্ছে না। এদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধিতে শ্রমজীবী মানুষের জীবন জেরবার। এই অবস্থায় নতুন করে মজুরি চুক্তি করা এবং তা কার্যকরী করতে বাধ্য করার জন্য আন্দোলনে নেমেছে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। গত ২০ এপ্রিল হরিহরপাড়া বিডিও অফিসে মহিলা বিড়ি শ্রমিকরা এক বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হয়ে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি, প্রতিটি শ্রমিকের লগবুক ও পরিচয়পত্র প্রদানের দাবি জানান। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন, কমরেডস্ দেবাশীষ গাঙ্গুলী, খোদাবক্স মণ্ডল, আফরোজা খাতুন, নূরজাহান বেগম, ফতেমা বিবি প্রমুখ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বহরমপুর সাবডিভিশনাল বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড আনিসুল আম্বিয়া।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির হামলার প্রতিবাদ

১৮ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা আদায়ের দাবিতে প্রচারপত্র বিলি করার সময় কো-অর্ডিনেশন কমিটির হামলার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২ মে এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"২ মে সকাল ১০-৩০ মিনিট নাগাদ ১৮ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা আদায়ের দাবিতে আন্দোলনরত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সমর্থনে এস ইউ সি আই দল কর্তৃক প্রকাশিত প্রচারপত্র বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সামনে বিলি করা হচ্ছিল। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই অফিসের সামনে বিলি করার সময় কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা এস ইউ সি আই দলের কর্মীদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে এবং প্রচারপত্রগুলি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

"উপস্থিত সরকারি কর্মচারীরা কো-অর্ডিনেশনের নেতাদের এই ঘৃণ্য আচরণের প্রতিবাদ করলে আক্রমণকারীরা পশ্চাদপসরণ করে।

"আমরা কো-অর্ডিনেশনের নেতাদের এই হামলার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর জঘন্য আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছি। আমাদের বিশ্বাস সমস্ত রকম ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।"

জলপাইগুড়ি

স্কুল পরিচালন কমিটির নির্বাচনে ফি বৃদ্ধিবিরোধী ছাত্র ও অভিভাবক সমিতির জয়

গত ২৪ এপ্রিল জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে রংধামালীর ধনাইমালী জুনিয়ার হাইস্কুলের (পাদরীকুঠী) পরিচালন সমিতির নির্বাচনে সি পি আই (এম) প্রার্থীদের বিপুল ভোটে পরাস্ত করে ছাত্র-অভিভাবক সংগ্রাম কমিটির প্রার্থীরা সবকটি আসনেই জয়ী হন। দীর্ঘদিন ধরে সি পি আই (এম) স্কুল পরিচালন সমিতির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখলেও এবার তারা শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে।

সংগ্রাম কমিটি গত কয়েক বছর ধরে ডোনেশনের নামে উচ্চহারে ফি আদায়ের বিরুদ্ধে এবং জুনিয়ার স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করার দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছে তারই ফলে এই জয় বলে স্থানীয় অভিভাবকরা মনে করেন। সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক কালেশ্বর দাস এবং সভাপতি নরেন্দ্রনাথ রায় বলেন — উল্লিখিত দাবিগুলি ছাড়াও অবিলম্বে মেয়েদের জন্য কমনরুম ও একটি সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। ছাত্র-অভিভাবক কমিটির নেতা রবি রায় এই জয়ের জন্য ছাত্র ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

'জীবনশৈলী শিক্ষা' ও গ্রেডেশান প্রথার বিরুদ্ধে

শিক্ষক কনভেনশন

রাজ্য সরকার ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে বিদ্যালয় স্তরে জীবনশৈলী নামের আড়ালে যৌনশিক্ষা ও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গ্রেডেশান প্রথা প্রচলনের শিক্ষা সংহারক নীতির প্রতিবাদে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির (এস টি ই এ) উদ্যোগে গত ১৯ মার্চ বাঙ্গুর হাইস্কুলে দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণ শহরতলি মহকুমা কমিটি এক শিক্ষা কনভেনশনের আয়োজন করে। ঐ কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সমিতির পত্রিকা 'শিক্ষাবার্তা'র প্রাক্তন সম্পাদক নির্মলচন্দ্র সাহা। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক রতন লস্কর। দু'টি মহকুমার অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলি থেকে শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী ঐ কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন। ডাঃ পড়িয়া বলেন, বিদ্যালয় স্তরে যৌনশিক্ষা প্রচলন করার বিষয়ে পর্ষদের কর্মকর্তা এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত নেওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়নি। এছাড়া বিষয়টি বিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে গেলে কেবলমাত্র অ্যানাটমি বা ফিজিওলজি জানা শিক্ষকই যথেষ্ট নন, কারণ এটি মনস্তত্ত্বেরও বিষয়। নবজাগরণের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যাঁরা বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তাঁরাও কেউই এই বিষয়টি স্কুলস্তরে আনার কথা ভাবেননি। কিন্তু হঠাৎ করে ষষ্ঠশ্রেণী থেকে যেভাবে বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকছে। তিনি বলেন, বিদ্যালয়স্তরে ষষ্ঠশ্রেণী থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রথমে উদ্ভিদ পরে ব্যাঙ এবং তারও পরে মানবদেহের যে আলোচনা আছে তাই যথেষ্ট। এর উপর যৌনশিক্ষা দেওয়ার অর্থ ছাত্রছাত্রীদের বিপথে পরিচালিত করা। এটা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। সর্বোপরি পারিবারিক আবহাওয়ায় যে শিক্ষা স্বাভাবিকভাবে বয়ঃপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে শেখা হয়, প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে সে শিক্ষা কখনোই সুস্থভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। স্বভাবতই সন্তানসম ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন সকলকে নিয়ে আরো বেশি সেমিনার, সিম্পোজিয়াম পরিচালনা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে এস টি ই এ-র উদ্যোগী ভূমিকা নেওয়ায় তিনি সংগঠনকে অভিনন্দন জানান।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক রতন লস্কর বলেন, শিক্ষার সকল স্তরেই পাঠক্রম বা সিলেবাস নির্ধারণের সময় পরিবেশ, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদির প্রেক্ষাপটেই তা স্থির করা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের হলেও একথা সত্য যে, রাজ্য সরকার এগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে পাঠক্রম নির্ধারণ করে না। এমনকী স্কুলস্তরে পাঠক্রম নির্ধারণে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কোন মতামত গ্রাহ্য করা হয় না। ফলস্বরূপ শিক্ষাব্যবস্থা, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে না। যে দু'টি বিষয় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে একেবারে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে যা সম্প্রতি চালু হতে চলেছে, তা হ'ল যৌনশিক্ষা এবং গ্রেডেশান প্রথা। বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্রছাত্রীদের সৃষ্টিশীলতায় অনুপ্রাণিত করার জন্য যেখানে দরকার ছিল শিক্ষা-সাহিত্য-খেলাধূলা-মনীষীচর্চা-চরিত্রগঠনে উদ্বুদ্ধ করা এবং তারজন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা, তা না করে তথাকথিত 'জীবনশৈলী' শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে তাদের অবাধ যৌন ব্যভিচারের দিকে ঠেলে দিয়ে যৌবনকে ধ্বংস করে দেবে। গ্রেডেশান প্রথাও শিক্ষার মানকে অধঃপতিত করবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা এস টি ই এ-র পক্ষ থেকে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করছি।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশ্বজিৎ মিত্র, শম্পা সরকার, সাহাবুদ্দিন মণ্ডল, ক্ষুদিরাম মান্না।

শোষণমুক্তির শপথে

রাজ্যে রাজ্যে এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত

আসাম

দলের ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আসাম রাজ্য কমিটির আহ্বানে গত ২৪ এপ্রিল গুয়াহাটির বিষ্ণু নির্মলা ভবনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে সমাগত শত শত কর্মী, সমর্থক, দরদী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় দলের রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সিদ্ধেশ্বর শর্মা সভাপতিত্ব করেন। মুখ্যবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। কমরেড ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন, এ যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ এদেশের মাটিতে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিটি কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে ওঠার যথার্থ লেনিনীয় পদ্ধতি অনুসরণ না করার ফলে যে একটি পেটিবুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি হিসেবে গড়ে উঠেছে, একথা বিশ্লেষণ করে দেখান এবং দেশের মানুষের মুক্তির জন্য একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টিরূপে এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট রাশিয়ায় শোধনবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং অবশেষে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টিটি একটি বুর্জোয়া পার্টিতে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাষ্ট্র একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। তার পর পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে সমাজতান্ত্রিক শিবির ভেঙে পড়ে। ঠিক একইভাবে মাও সে-তুঙের মৃত্যুর পর চীন দেশেও শোধনবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বছরখানেক পূর্বে সেই চীন দেশটিও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাপট এবং তাদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী বিশ্বের বাজারে অনুপ্রবেশের সুযোগের আশায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসরে পরিণত হয়েছে এবং দেশের জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই আজ একই চিত্র। সাথে সাথে এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, আজ দেশে দেশে এমনকী খোদ আমেরিকাতেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। কিন্তু মার্ক্সবাদের প্রাণসত্তাকে আধার করে যদি দেশে দেশে সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে এবং তার নেতৃত্বে যদি আবার দেশে দেশে গণজাগরণের সৃষ্টি হয়, তাহলেই একমাত্র সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই গণজাগরণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আবার কোণঠাসা করতে পারবে এবং দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের বিজয় সূচিত হবে।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, সমগ্র দেশ আজ অভাব-দারিদ্র্যের তীব্র জ্বালায় নিষ্পেষিত। গ্রামে দশ শতাংশ মানুষের হাতে সমস্ত জমি কেন্দ্রীভূত, বাকি সব খেতমজুর। গ্রামে কোন কাজ না থাকায় তারা জীবিকার তাড়নায় শহরের দিকে ছুটছে। শহরে গরিব মানুষের বস্তি বাড়ছে, কল-কারখানায় লালবাতি জ্বলছে, ছাঁটাই ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত যুবকদের জীবিকার কোন ব্যবস্থা নেই, দুর্নীতি ব্যাপক রূপ নিয়েছে। পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সরকারগুলো দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানাগুলো দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বিদেশের বহুজাতিক সংস্থার হাতে, যা কার্যত মার্কিন পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, জলের দামে বিক্রি করে দিচ্ছে। দেশের বাজারও আজ উন্মুক্ত। বর্তমানের কেন্দ্রীয় সরকার এগুলো করতে পারছে সি পি আই (এম), সি পি আই-এর সমর্থনের ভিত্তিতে। এই তথাকথিত বামপন্থী দল দুটো তাদের সমর্থনের পিছনে বিজেপি'র সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করার কথা বলে চলেছে। যথার্থ মার্ক্সবাদীরা এই কথা জানেন যে, দেশের সমস্ত ভাষা-ভাষী, ধর্মাবলম্বী শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে দুর্বার বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার পথে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত আন্দোলন পরিচালনা ব্যতিরেকে পার্লামেন্টে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে কোনমতেই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। আজ তারা ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও আর এস এসের তৎপরতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা যে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী নীতিগ্রহণের ক্ষেত্রে সি পি আই (এম), সি পি আই আজ এই সমস্ত কথার জাল সৃষ্টি করে মনমোহন সিং-এর মন্ত্রণাদাতায় পরিণত হয়েছে। জনগণের ভয়ে তারা মন্ত্রীত্বে যায়নি, কিন্তু বাইরে থেকে ক্ষমতা ভোগ করছে। যে পশ্চিমবঙ্গ একদিন বামপন্থার ভাবধারায় টগবগ করছিল, তাদের ২৭ বছরের শাসনে সেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তারা ক্লীবে পরিণত করতে চাইছে। কিন্তু এরই মধ্যে সমগ্র দেশে সঠিক লাইনের ভিত্তিতে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই'র শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে।

কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

আসামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, বিগত কয়েক বছরে আলফার নেতৃত্বে হাজারেরও অধিক যুবক মিলিটারির বুলেটের সামনে মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন জাগরণের সৃষ্টি হয়নি। এই ঘটনা আবার এই সত্যকে তুলে ধরছে যে, সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালিত না হলে হাজার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামও মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারে না। সর্বশেষে কমরেড ভট্টাচার্য মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নির্দেশিত পথে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আইকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

সভায় আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরীও বক্তব্য রাখেন।

ত্রিপুরা

এস ইউ সি আই দলের ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ২৪ এপ্রিল আগরতলার শকুন্তলা রোডে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। সভার সভাপতি কমরেড মলিন দেববর্মা প্রথমে ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও এস ইউ সি আই দলের ভূমিকা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। পরে সভার প্রধান বক্তা দলের কেন্দ্রীয় স্টাফ বিশিষ্ট জননেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে বলেন, এযুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার সাথে যুক্ত হয়ে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপলব্ধির ভিত্তিতে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এদেশে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির অনুপস্থিতির কারণে স্বাধীনতার ফল চলে যাচ্ছে দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে, ফলে দেশের গণমুক্তির জন্য একটি প্রকৃত সাম্যবাদী দলের প্রয়োজন। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন থেকেই তিনি গুটিকয়েক সহযোদ্ধাকে নিয়ে এস ইউ সি আই দল গড়ে তোলেন। তাঁর অক্লান্ত সংগ্রামের ফলে এবং ১৯৭৬ সালে তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে দল আজ ২০টি'রও বেশি রাজ্যে বিস্তার লাভ করেছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে একটার পর একটা গণআন্দোলন সংগঠিত করছে। তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর আজ আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা সারা বিশ্বকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে শাসক দলগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধছে। অন্যদিকে আশার আলো এই যে, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠছে। আজ যারা বিশ্বে নতুন করে সাম্যবাদী দল গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁদের অনেকের মধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার চর্চা হচ্ছে এবং বিদেশি ভাষায় তাঁর লেখার অনুবাদ হচ্ছে। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট নামধারী দলগুলি শুধু আন্দোলনের ঝাণ্ডা ফেলে দিয়েছে তাই নয়, আজ ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে তারা পরিষদীয় রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং কংগ্রেসের সাথে গাঁটছড়া বেধে তার মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিশীলতা খুঁজে পেয়েছে। দেশে পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে এস ইউ সি আইকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

ত্রিপুরার সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রতিভা মুখার্জী

গুজরাট

দলের ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গুজরাট রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে বরোদায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড ভরত মেহতা। পার্টির সেন্ট্রাল স্টাফ কমরেড ছায়া মুখার্জী প্রধান বক্তা হিসাবে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা মুনাফার লক্ষ্যে উৎপাদন করতে গিয়ে জনজীবনের সঙ্কটের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দেয় না। কংগ্রেস সরকার কিংবা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারই কেবল ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করছে এমন নয়, সি পি আই এবং সি পি এম-এর মতো তথাকথিত মার্ক্সবাদী দলগুলি যেসব রাজ্যে ক্ষমতায়, সেখানেও একই কাজ করে চলেছে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তি হিসাবে এরা শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী ভূমিকা পালন করছে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারকে ও তার জনস্বার্থবিরোধী নীতিগুলিকে সমর্থন করছে।

এদেশের একমাত্র প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আইকে সমর্থনের জন্য কমরেড মুখার্জী সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার দ্বারাই জনগণ সমস্ত রকম অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ, জুলুমের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই দলটি সাধারণ মানুষের স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলনগুলি গড়ে তুলছে।

কমরেড ছায়া মুখার্জী ছাড়াও সভায় কমরেডস্ দ্বারিকানাথ রথ, তপন দাশগুপ্ত, রামভরত, জয়েশ প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারের ভাতুবস্তিতে এস ইউ সি আই-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ২৫ জন কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে

আটের পাতায় দেখুন

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ২৪শে এপ্রিল উদ্‌যাপিত

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রায় ৩০০ বন্দীর উপস্থিতিতে এস ইউ সি আই-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয়। কমরেড রাজারাম রায়মণ্ডলকে সভাপতি নির্বাচিত করে সভার কাজ শুরু হয়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর তাঁর উপর রচিত গান পরিবেশিত হয়। অসুস্থ সভাপতি কমরেড রাজারাম রায়মণ্ডল আবেগজড়িত কণ্ঠস্বরে গরিব মানুষের একমাত্র দল এস ইউ সি আই'কে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রিয় দল এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। কমরেড উত্থান পাল গণদাবীতে প্রকাশিত, 'কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে স্মরণ করি' — এই নির্বাচিত অংশটুকু পাঠ করে শোনান। প্রধান বক্তা কমরেড প্রণব চ্যাটার্জী তাঁর বক্তব্যে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের ভয়াবহ রূপটি তুলে ধরেন এবং এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে উঠছে তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন শাসক দলগুলি কীভাবে মালিকশ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত এবং পাশাপাশি এস ইউ সি আই কীভাবে গরিব মানুষের স্বার্থে একটার পর একটা আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছে তার বিশদ বিবরণের শেষে এস ইউ সি আই-কে সর্বদিক থেকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ তবু নাকি শিল্পায়ন হচ্ছে

একের পাতার পর

বিস্তার ঘটিয়েছিল, মানুষকে ধর্মান্ধতার অন্ধকার থেকে বের করে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মানবতাবাদী আদর্শের সন্ধান দিয়েছিল। ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়গান করেছিল, গণতন্ত্র নিয়ে এসেছিল। আর আজ যেটাকে শিল্পবিপ্লব বলা হচ্ছে, তার চরিত্র চেহারা গোটা বিশ্বে তথা আমাদের দেশে কী? আমরা দেখছি হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ, প্রতিদিন আরও বন্ধ হচ্ছে। লকআউট, লে-অফ প্রতিদিনের ঘটনা। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে তথাকথিত সংস্কারের ধাক্কায় সাড়ে তিন কোটির মতো লোক কর্মচ্যুত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সাড়ে তিন লক্ষ চাকরির পদ বিলোপ করেছে। আরও সাড়ে ১২ লক্ষ পদ বিলোপ করে দেবে। ব্যাঙ্ক, প্রতিরক্ষা, রেল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করতে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও উন্নয়নের একই চেহারা। ৪০ হাজার রেজিস্টার্ড কারখানার মধ্যে ২৯ হাজারের বেশি বন্ধ, তবু নাকি শিল্পায়ন হচ্ছে! ১৯৮৫ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে এই পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের কর্মসূচির ধাক্কায় ১২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮৬৩ জন শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা রাজ্যেই ছাঁটাইয়ের এই চেহারা। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৫ বছরে কাজ পেয়েছে মাত্র ৪৩ হাজার ৩৩৫ জন। সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ১ লক্ষ ৬০ হাজার চাকুরির পদ উঠিয়ে দিয়েছে, লোক নেবেনা। বিলুপ্ত পদের সংখ্যা আরও বাড়ছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল মোট কৃষকের ৩৯.৬ শতাংশ, ২০০০ সালে সেটা দাঁড়ায় ৪৯.৮ শতাংশ, অর্থাৎ ১০ শতাংশ বেড়ে গেল। এখন ২০০৫ সাল, অনুপাতটা ৬০ শতাংশ হয়ে থাকলে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এদেশে প্রতিদিন গ্রাম থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেরিয়ে আসছে; ভেসে বেড়াচ্ছে এ শহরে সে শহরে। এরা ভবঘুরে শ্রমিক। কখনও কাজ জোটে, অধিকাংশ সময়ই জোটেনা। এদেশে আগে কখনও শুনেছেন, প্রতি বছর হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে? এখন উন্নয়নের ধাক্কায় সেটাই ঘটছে। সরকার ঘোষণা করেছে — শিক্ষার দায়িত্ব নেবে না, ব্যবসায়ীরা শিক্ষা চালাবে। যার টাকা আছে, সে পড়তে পারবে। হাসপাতালের দায়িত্বও সরকার নেবে না, সেগুলোও ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের ঋণের পরিমাণ ৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকা থেকে ১৫ বছরে বেড়ে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। অন্যদিকে দেখুন, ভারতের ১০০টি একচেটে পুঁজিপতিগোষ্ঠী, যারা আন্তর্জাতিক বহুজাতিক সংস্থার পার্টনার, তাদের মুনাফা বেড়েছে ৪১ শতাংশ। এখন যাকে নিয়ে খুব হৈ চৈ, সেই উইপ্রো'র মালিক আজিম প্রেমজি এবার ৫৮ শতাংশ মুনাফা করেছে। অর্থাৎ যা কিছু উন্নয়ন, তা হচ্ছে এদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি, বড় বড় ব্যবসায়ী এবং তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলির। দেশের শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ, যারাই সংখ্যায় বেশি, তাদের জীবনে সমস্যা সঙ্কট ভয়াবহভাবে বাড়ছে।

তিনি বলেন, 'সংস্কার' নামে একটা কথা এখন খুব চালু হয়েছে। আগে 'সংস্কার' বলতে বোঝাতো জনগণের স্বার্থে কিছু কল্যাণমূলক কাজ — যেমন ভূমিসংস্কার, অর্থাৎ ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করা। শ্রম আইনের সংস্কার করা মানে বোঝাতো শ্রমিকদের কিছু সুযোগ সুবিধা ও অধিকার দেওয়া। এই সংস্কার সম্পর্কেই আমরা বিপ্লবীরা বলতাম, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে এই ধরনের সংস্কারের দ্বারা মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে না, বিপ্লবের প্রয়োজন। এখন সরকারি সংস্কারনীতির মানে দাঁড়িয়েছে — কলকারখানা, অফিসে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা কমাও, ১০ হাজার জনের কাজ ১ হাজার জনকে দিয়ে করাও, বাকিদের ছাঁটাই কর, স্বেচ্ছাবসরের নামে জোর করে বসিয়ে দাও। এখন 'সংস্কার' কথাটার মানে হচ্ছে, শ্রমিকদের স্থায়ী কাজ, স্থায়ী মজুরি, এমনকী সর্বনিম্ন মজুরি বলেও কিছু থাকবে না। কাজ পাবে চুক্তির ভিত্তিতে, যেখানে পি এফ-গ্র্যাচুইটি থাকবে না। মালিকরা ইচ্ছামতো ছাঁটাই করতে পারবে, প্রশ্ন তোলা যাবেনা। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেও, দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী যতটুকু সুযোগ-সুবিধা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করতে পেরেছিল, আইন করতে সরকার বাধ্য হয়েছিল, আজ সেগুলিও পুঁজিপতিশ্রেণীর আরও মুনাফার স্বার্থে কেড়ে নেওয়াকেই 'সংস্কার' বলা হচ্ছে। যার মর্মার্থ হচ্ছে, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবন-মরণ সবই বাজারের হাতে ছেড়ে দাও, যে বাজারে দেশি-বিদেশি পুঁজির মুনাফার স্বার্থই প্রথম ও শেষ কথা।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চরম সঙ্কটে পড়েই আজ এইসব পদক্ষেপ নিচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানেই বাজার অর্থনীতি, সেটাই আজ চরম সংকটের সম্মুখীন। অথচ পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনের ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববাজার আর নেই, তাদের বাজারও বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের আওতায় এসেছে। শুধু তাই নয়, তুলনায় অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতা অর্জন করে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সহায়তা পেয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিছুটা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল 'জোট নিরপেক্ষ' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সেটাও চূড়ান্ত দুর্বল হয়ে যায়। ফলে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের বাজারই আজ সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের হস্তগত। তবুও পুঁজিবাদের বাজার সঙ্কট আজ এমন জায়গায় এসেছে যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। পুঁজিবাদে উৎপাদন ক্ষমতা আজ বিপুল, কিন্তু তাকে ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি করতে হলে মানুষের যে ক্রয়ক্ষমতা থাকা দরকার, তা নেই। পুঁজিবাদই শোষণ করে করে বেশি বেশি সংখ্যায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিঃশেষ করে দিয়েছে ও দিচ্ছে। গোটা বিশ্বে যদি ক্রমাগত বেকার বাড়ে, হাহাকার বাড়ে, তবে বাজারে ক্রেতা থাকবে কি করে? তাই দেখা যাচ্ছে, যে মার্কিন পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বলা হয় বিশ্ব পুঁজিবাদের ইঞ্জিন, তার চাকা এখন মাটিতে বসে যাচ্ছে। আমেরিকার খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন, সেখানে শিল্পাঞ্চল মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। কারখানা বন্ধ, হাজার হাজার শ্রমিক বেকার, দেশে তীব্র বাজার সঙ্কট। কয়েক লক্ষ লোক ফুটপাতে থাকে, লঙ্গরখানায় খাবার সংগ্রহ করে। একই অবস্থা ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি, ইংল্যান্ড ও জাপানের। সর্বত্র কলকারখানা বন্ধ, দেশ বেকারে ছেয়ে গেছে। কারণ, বাজার নেই — অর্থাৎ পণ্য কেনবার ক্ষমতা মানুষের নেই। ফলে, শিল্পের বিকাশ দূরের কথা, যেসব শিল্প আছে তার উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার হচ্ছে না, শুধু মুনাফা বৃদ্ধির জন্য ছাঁটাই হচ্ছে, কাজ অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনীতির তীব্র সংকট প্রসঙ্গে মহান নেতা স্ট্যালিন সে সময়ই দেখান যে, ভোগ্যপণ্যের বাজার যখন শুকিয়ে যাচ্ছে, পুঁজিবাদ আর একটা বাজার কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করছে — অস্ত্রের বাজার। মালিকরা অস্ত্র তৈরি করবে, কিনবে সরকার। এইভাবে অস্ত্র উৎপাদনকেও পুঁজিবাদ একটি শিল্পে পরিণত করে, সেখানে উৎপাদন বাড়িয়ে বাজারে কৃত্রিম তেজীভাব তৈরির চেষ্টা করছে। যেমন, সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে, মার্কিন সরকার যদি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ভারতকে এবার বিক্রি করতে না পারত, তাহলে আমেরিকায় ঐ বিমান তৈরির কারখানায় লালবাতি জ্বলত, ৫ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়ে যেত। ফলে, মুমূর্ষু পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অক্সিজেন যোগানোর জন্য যুদ্ধশিল্প চাই। এ কেবল শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিরই চাই তা নয়, কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, শিল্পোন্নত কিংবা শিল্পে কিছুটা পিছিয়ে-পড়া কোন পুঁজিবাদী দেশই আজ সামরিক অর্থনীতি ছাড়া বাঁচতে পারেনা। এজন্য সকলেরই দরকার সীমান্ত যুদ্ধ, উত্তেজনা, মাঝে মাঝে সংঘর্ষ। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদীদের দরকার বড় মাপের যুদ্ধ। যত অস্ত্র ধ্বংস হবে, ততই বেশি বেশি অস্ত্রের অর্ডার আসবে, অর্থনীতি একটু চাঙ্গা হবে।

২৪ এপ্রিল কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে গার্ড অফ অনার জানাচ্ছেন কমসোমল কর্মীরা

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এই যে গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন, এও একটা যুদ্ধ এখন। এই বিশ্বায়ন-এর পটভূমিটা আপনাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ৮০'র দশকের শেষভাগে আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড এইসব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক যুদ্ধ চলছিল। সংবাদপত্রে বলা হত - বাণিজ্য যুদ্ধ বা ট্রেড ওয়ার। ঘন ঘন বৈঠক করেও কোন মীমাংসা তারা করতে পারছিল না। বাজার নিয়ে এই বিরোধ যখন তীব্র হচ্ছে, তখনই এল ডাঙ্কেল প্রস্তাব, যার ভিত্তিতেই বিশ্বায়ন। এই প্রস্তাবের মূল কথা ছিল বাজার সঙ্কট মেটাতে অনুন্নত দেশগুলির বাজার গ্রাস করো। এখন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া নেই, সোভিয়েট ইউনিয়ন নেই, ফলে আপেক্ষিক অর্থে অনুন্নত বা দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলি, আমেরিকা ও অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক চাপ ঠেকাতে পারবে না; ফলে এই দেশগুলির বাজার সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নাও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী নিজেদের পুঁজিবাদী জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও সংহত করে গড়ে তোলার জন্য বাণিজ্যিক প্রাচীর খাড়া করেছিল, যাতে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ঢুকে প্রতিদ্বন্দ্বী না হতে পারে। এজন্য বিদেশি পণ্যের উপর চড়া হারে শুল্ক, বিদেশি পুঁজির প্রবেশের পথে নানা বাধা তৈরি করা হয়েছিল — যেটাকে শুল্কের প্রাচীর, সংরক্ষণের প্রাচীর বলে। ১৯৯৪ সালে নতুন গ্যাট চুক্তির মধ্য দিয়ে ঐ প্রাচীরগুলিকে ভেঙে ফেলার ফরমান জারি করা হল। অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি ঋণের জন্য যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের সংস্থা বিশ্ব ব্যাঙ্ক-আই এম এফ-এর উপর নির্ভরশীল, আবার বিশ্বে রপ্তানির বাজারে সামান্য জায়গা পেতে হলেও আমেরিকা সহ অন্য বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপর এদের নির্ভর করতে হয়। ফলে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদীদের ফরমান না মেনে উপায় নেই। আবার এদের মধ্যে যেসব দেশ কিছুটা এগিয়ে আছে, যেমন ভারতবর্ষ, তাদের ভূমিকা অন্যরকম। ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজি ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির জন্ম দিয়েছে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির তুলনায় ছোট হলেও, ভারতবর্ষ নিজেই একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে দাঁড়িয়েছে, সে দক্ষিণ এশিয়ায় নিজের আধিপত্য চায়। এই লক্ষ্য থেকেই ভারতবর্ষ একসময় সমাজতান্ত্রিক শিবির ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দ্বন্দ্বকে নিজ স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। এই ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, বিশ্ববাজারে ঢুকবার জন্য তাদের নিজেদের যে উচ্চাকাঙ্খা, বিশ্বায়নের ফলে, তা পূরণ করার সুযোগ দেখতে পেয়েছে। এদের অবস্থান এইরকম — 'ভারতের বাজার কিছু দেব, বিনিময়ে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদীদেরও আমাদের কিছু বাজার ছাড়তে হবে।' এরই ভিত্তিতে ভারতীয় একচেটে পুঁজিও বিশ্বায়নের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করল। সাম্রাজ্যবাদীরা যদি এমন একটি পরিকল্পনা না করতে পারত, তাহলে পাঁচটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুধু বাণিজ্য বিরোধের মধ্যেই সম্ভবত সীমাবদ্ধ থাকত না। আবার বিশ্বায়নের দ্বারাও সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের নিরসন হয়নি, তা হওয়ার কথাও নয়।

আমাদের দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী, যাঁদের মধ্যে অনেকে আবার নিজেদের মার্ক্সবাদী বলে দাবি করেন, তাঁরা বলছেন, এখন বিশ্বায়নের যা সমস্যা, সে সম্পর্কে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ নাকি আলোকপাত করেনি। আসলে এঁদের কাছে বিশ্বায়ন

পাঁচের পাতায় দেখুন

দেশি একচেটে পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সিপিএম-এর লড়াই কোথায় গেল ?

চারের পাতার পর

মানে সাম্রাজ্যবাদ নয়, অন্য কিছু। এখানেই তাঁরা ভুল করছেন। আজ থেকে দেড়শো বছরেরও আগে মার্ক্স কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতেই দেখান যে, মুনাফার তাড়নায় পুঁজি বিশ্বের সর্বত্র ঢুঁ মারবে, যেখানেই বাড়তি মুনাফার সন্ধান পাবে শিকড় গেড়ে বসবে, পুরনো সামাজিক রীতিনীতি সবকিছু ধ্বংস করবে। বলেছিলেন, বিপুল উৎপাদন ক্ষমতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশাল বিস্তার ঘটিয়ে আধুনিক

২৪ এপ্রিলের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

বুর্জোয়ার অবস্থা দাঁড়িয়েছে পুরাকাহিনীর সেই যাদুকরের মতো যে বোতল খুলে দৈত্যকে বের করে ফেলে আর সামলাতে পারছে না।

মার্ক্সের সময়টা ছিল পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ। পরে যখন পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদে পৌঁছাল, যখন অবাধ প্রতিযোগিতার স্থানে দেখা গেল উৎপাদন ও বাজারের উপর মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য, তখন এক দল বলল, এই নতুন বৈশিষ্ট্যের কথা মার্ক্সের লেখায় নেই, অতএব মার্ক্সবাদ দিয়ে চলবে না, তা ভ্রান্ত। এদের জবাব দিয়ে লেনিন দেখালেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার যে মূল নিয়মগুলি অবাধ প্রতিযোগিতার স্তরে মার্ক্স উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন, সেই নিয়মের পথ ধরেই, অর্থাৎ তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান একচেটিয়া পুঁজির স্তরকে বুঝতে হবে এবং এটা একটা নতুন স্তর যাকে লেনিন পুঁজিবাদের বিকাশের শেষ স্তর — সাম্রাজ্যবাদী স্তর বলেছেন। লেনিন দেখালেন, পুঁজির ক্রমাগত কেন্দ্রীভবনের মধ্য দিয়ে এযুগে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম হয়েছে, পুঁজির জোরে গোটা অর্থনীতির উপর যার নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বিরাট। বিভিন্ন শিল্পে খাটা একচেটিয়া পুঁজির সাথে আবার ব্যাঙ্ক পুঁজির মিলন বা মিশ্রণ ঘটিয়ে ফিনান্স ক্যাপিটাল বা লগ্নি পুঁজির উদ্ভব হয়েছে। এর ফলে এক একটি একচেটিয়া পুঁজি গোষ্ঠী বা কোম্পানির হাতে বিপুল পুঁজি সঞ্চিত হচ্ছে, যা বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে মুনাফা লুটবার জন্য জাতীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে অপর দেশে ছুটছে কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমশক্তির খোঁজে। বিভিন্ন দেশের বাজার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার জন্য নানা দেশের বিশেষ বিশেষ শিল্পের একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীগুলি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেও 'সমিতি' গড়ে তুলছে, যাকে তিনি 'ট্রাস্ট অ্যাণ্ড কার্টেল' বলেছিলেন। আজকের বহুজাতিক সংস্থা বা মাল্টিন্যাশানালের মধ্যে আমরা ঐ কার্টেলের শক্তিশালী রূপ দেখছি, যে কথাটা কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগেই আমাদের বলে গিয়েছেন — যদিও সেদিনের কার্টেলগুলির তুলনায় আজকের বহুজাতিক সংস্থা বা মাল্টিন্যাশানালগুলির লগ্নী পুঁজির জোর ও ক্ষমতা কয়েকশত গুণ বা তারও বেশি, দাপটও অনেক বেশি।

লেনিন এও দেখালেন যে, বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজির পরগাছা চরিত্র, অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন থেকে পুঁজির উত্তরোত্তর বিচ্ছিন্নতা আরও প্রকট হচ্ছে। মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীর হাতে বিপুল পরিমাণ মানি ক্যাপিটাল জমা হয়েছে, যা বাজারের অভাবে শিল্পে বিনিয়োগের পরিবর্তে বিভিন্ন দেশে ফাটকায় খাটছে, সুদের পিছনে ছুটছে। লেনিন দেখালেন যে, এযুগে কিছু রাষ্ট্র মূলত 'সুদখোর' রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। লেনিনের ব্যাখ্যা করা সাম্রাজ্যবাদের এই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলিই তো আজ আমরা বিশ্বায়নের মধ্যে বেশি বেশি করে দেখছি। আমাদের এই ভারতবর্ষেই যত বিদেশি পুঁজি আসছে, তার কতটুকু উৎপাদনে যাচ্ছে ? বেশিরভাগই শেয়ারবাজারে ফাটকায় খাটছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি দিকও আমি দেখাতে চাই। আমাদের দেশে অনেকে মনে করে, কোনও একটা পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতিতে যদি বিদেশি লগ্নিপুঁজির প্রাধান্য থাকে, তাহলে সেই দেশ আর স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র থাকে না। বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে লগ্নিপুঁজির আধিপত্য অনেক বেড়ে যাওয়ায়, এই ধারণা কারো কারোর মধ্যে আরও প্রবল হয়েছে, যার ফলে তারা এমনকী ভারতবর্ষের মতো একটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, যে নিজেই আধিপত্যকামী, তাকেও 'আধা-ঔপনিবেশিক' রাষ্ট্র বলে মনে করে। এই চিন্তার ফলেই এরা বিশ্বের কয়েকটি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশ ছাড়া অন্য কোনও রাষ্ট্রকেই, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কোন দেশকেই স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র বলে মনে করে না — যেজন্য এ ধরনের সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই এরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকেই ঢালাওভাবে বিপ্লবের সাধারণ লাইন বলে ধরে নিয়েছে, যেটা ভ্রান্ত। অথচ, লগ্নিপুঁজির বিশ্বজোড়া আধিপত্যের যুগে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভব কি না, এই প্রশ্ন লেনিনের সময়ই উঠেছিল এবং তার মীমাংসাও লেনিনবাদেই পাওয়া যাবে। লেনিন বলেছেন, 'সমস্ত রকম অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে লগ্নিপুঁজি এমনই একটা বিরাট, এমনই একটা অমোঘ শক্তি যে, এমনকী পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলিকেও লগ্নিপুঁজি নিজের অধীনস্থ (subjecting) করতে পারে, এবং বাস্তবে তা করে থাকেও।' সুতরাং আজ লগ্নিপুঁজির বিশ্বজোড়া ব্যাপ্তির ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতের মতো পুঁজিবাদী দেশগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে গেছে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এমন ধারণার সাথে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

তিনি বলেন, কংগ্রেস-বিজেপি হচ্ছে একচেটে পুঁজিপতিদেরই চিহ্নিত রাজনৈতিক প্রতিনিধি, ফলে তারা স্বাভাবিকভাবেই খোলাখুলি বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করছে ও করে যাবে। কিন্তু সি পি এম, সি পি আই, যারা নিজেদের বামপন্থী, এমনকী মার্ক্সবাদী বলে দাবি করে, তাদের ভূমিকাও তো আলাদা কিছু নয়। বরং এই 'উন্নয়ন' ও 'সংস্কারে' নরেন্দ্র মোদি বেশি যোগ্য, না বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বেশি যোগ্য, দেশিয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলির স্বার্থ কে ভাল দেখতে পারে — কংগ্রেস না সি পি এম, তা নিয়েই তো এখন প্রতিযোগিতা চলছে ! এজন্য দেশের একচেটে পুঁজিপতিদের শিরোমণি, বর্তমানের এক নম্বর ধনী আজিম প্রেমজি'র মুখে সি পি এম মুখ্যমন্ত্রীর জন্য প্রশংসা। বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পবন্ধু', যার আসল কথা হল 'শিল্পপতিদের বন্ধু'। কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রীও একই ভাষায় প্রশংসা করছেন। বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার কর্তারা, এমনকী সরাসরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিনিধিরা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সার্টিফিকেট দিচ্ছে। কিছুদিন আগেই বাণিজ্যসংক্রান্ত কূটনীতি বিষয়ে আমেরিকার একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভারতে এসেছিলেন, এখানে ইউ পি এ সরকারের আমলে 'সংস্কার' কেমন চলছে, তা দেখতে। যাওয়ার সময় খুশি হয়ে তিনি বলেছেন, দিল্লির সরকারের পিছনে সি পি এম থাকলেও, আমি কলকাতায় যা দেখেছি, তাতে বুঝেছি যে, সি পি এমও 'সংস্কারে'র পথেই হাঁটছে, ফলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। দিল্লিতে তথাকথিত বামপন্থীরা মাঝে মাঝে যেসব কথা বলছে, সকলেই বোঝে, ওগুলো রাজনৈতিক দরকষাকষির জন্য।

সি পি আই ভেঙে নতুন দল গঠনের সময় সি পি এম নেতারা একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলেছিলেন, শিল্পের জাতীয়করণ দাবি করেছিলেন। এখন তাঁরা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পরম বন্ধু হয়েছেন। তাদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচিতে দেশিয় একচেটে পুঁজির পাশাপাশি বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলে, তা বাজেয়াপ্ত করার, ভারতে অবস্থিত বিদেশি সংস্থাগুলি জাতীয়করণ করার ডাক দিয়েছিল সি পি এম। সি পি আই ভেঙে সি পি এম গড়ার সময় এইসব বিপ্লবী বুলি নেতাদের মুখে শোনা গিয়েছিল। এখন, সেই সি পি এম নেতারাই বলছেন, বিদেশি পুঁজি যত বেশি আসে, ততই ভাল। এজন্য বিদেশি পুঁজিকে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে সন্তুষ্ট করার সবরকম উপায় তাঁরা নিয়েছেন। কোথায় গেল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ? কোথায় গেল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ? দলের কর্মীদের নেতারা বোঝাচ্ছেন, হোক না সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি, কিছু কলকারখানা হলে কিছু বেকারের চাকরি তো হবে !

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি যা আসছে, তাতে ক'টা শিল্প কলকারখানা হচ্ছে ? বড়জোর কিছু আই টি সেন্টার হচ্ছে, সফ্‌টওয়ার শিল্প হচ্ছে, যেগুলির কোনটাই মূল শিল্প নয়। মূল শিল্পক্ষেত্রে দৃষ্টি দিলে দেখা যাচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইস্পাত, কয়লা, চট, চা, ইত্যাদি সর্বত্র সঙ্কট, সব শিল্প ধুঁকছে। এখানে ছাঁটাই হচ্ছে লক্ষ লক্ষ, কর্মচ্যুত শ্রমিক আত্মহত্যা করছে, আর সল্টলেকের আই টি সেন্টারগুলোতে কয়েক শত চাকরি দেখিয়ে শিল্পায়নের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার বাড়ছে ; খরচ করার ক্ষেত্র নেই। ব্যাঙ্কে জমা টাকার পরিমাণ বাড়ছে, শিল্পবিনিয়োগ নেই। বাড়িঘর, ফ্ল্যাট আর কিছু ব্রিজ ও ফ্লাইওভার তৈরিতে ব্যাঙ্কের ঋণ যাচ্ছে। এখন জমি-বাড়ির, উপনগরীর ব্যবসায় বিদেশি লগ্নীপুঁজি ঢুকতে চাইছে, যেটা লেনিন ফিনান্স ক্যাপিটালের একটা বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখিয়েছিলেন। এদের জন্য রেড কার্পেট পেতে দিচ্ছে সি পি এম সরকার ! এটাকেই বলছে শিল্পায়ন, উন্নয়ন !

পার্টি কংগ্রেসে নেতারা বক্তৃতা দিয়ে বোঝাচ্ছেন, বিদেশি পুঁজিতে আপত্তি নেই, যদি তাতে শর্ত না থাকে। আজ আর আলাদা করে শর্ত আরোপ করার প্রয়োজন কোথায় ? ওদের শর্তের মূল কথা হচ্ছে, 'সংস্কার' মেনে নাও। মালিকদের হাতে অবাধ ছাঁটাইয়ের অধিকার, শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে দেওয়ার ও কাজের ঘন্টা বাড়িয়ে দেওয়ার অধিকার, মালিকের ইচ্ছামত কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, রাস্তাঘাট সহ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ ও মূল্যবৃদ্ধি করার অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার — এসবই হচ্ছে তথাকথিত সংস্কার নীতির মূল কথা, যেটা সি পি এম সরকার ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করেছে। এগুলি করাই তো বিশ্বব্যাঙ্ক বা এধরনের ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির অথবা বহুজাতিক সংস্থাগুলির শর্ত। এগুলো করা হয়ে থাকলে, আলাদা করে শর্ত দেওয়ার দরকারটা কী ? ফলে 'শর্ত দেওয়া চলবে না' বলে সি পি এম নেতারা যেসব কথা বলছেন, ওগুলো কর্মীদের বিভ্রান্ত করার কৌশল। তাহলে কোথায় গেল একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম ? কোথায় গেল তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই ?

যাঁরা মনে করেন, সরকারি ক্ষমতায় বসার আগে সি পি এম একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল, তাঁদের ধারণা ঠিক নয়। সি পি এম এবং সি পি আই যেদিন একটাই পার্টি ছিল, সেদিনও তারা যথার্থ মার্ক্সবাদী ছিল না, ভাঙনের পরও সি পি এম কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে কখনই গড়ে ওঠেনি। ১৯৪৮ সালে এস ইউ সি আই পার্টি প্রতিষ্ঠার সময়ই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, এদেশে সি পি আই যদি একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠত, তাহলে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলার কোনও প্রয়োজনই হতো না। স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্যায়ে তদানীন্তন অবিভক্ত সি পি আই-এর ভূমিকা, আগস্ট আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'জনযুদ্ধে'র ভ্রান্ত লাইন, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে পৃথক জাতি হিসাবে দেখিয়ে ভ্রান্ত দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতভাগ সমর্থন, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন যোদ্ধা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু সম্পর্কে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি — এইসব ধরে ধরে বিশ্লেষণ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান যে, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মূল বিচারধারাই সি পি আই দলটি আয়ত্ত করতে পারেনি, যে বিশেষ ধরনের সর্বব্যাপক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হয়, সেই সংগ্রামটিও ঐ দলের নেতৃত্ব করেনি। সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জনের সংগ্রামও ঐ দলের নেতাদের মধ্যে অনুপস্থিত। ফলে সি পি আই-কে কখনই একটি মার্ক্সবাদী দল বলা যায় না। সি পি আই ভেঙে ঐ একই প্রক্রিয়ায় সি পি এম তৈরি হয়েছে নিতান্তই নেতৃত্বের কলহ থেকে, কোনও মৌলিক আদর্শগত পার্থক্য সেখানে ছিল না। সকলেই দেখছেন, সি পি এমের বৈপ্লবিক কর্মসূচি আজ পি এফের সুদ আধ শতাংশ বাড়বে না কমবে ; ব্যাঙ্কে-টেলিকমে বিদেশি পুঁজির ভাগ ৭৪ না ৬৪ হবে ; পেনশন বিল কী হবে — এইসব প্রশ্নে এসে ঠেকেছে। এ নিয়ে তারা মাঝেমধ্যে ২/৪টে গরম কথা বাইরে বলেই সোনিয়া গান্ধীর বাড়ি গিয়ে বলে আসছে, 'আপনি ঘাবড়াবেন না, আপনার সরকার আমরা ৫ বছর টিকিয়ে রাখবই।' ইতিহাস পড়লেই দেখবেন, শুধু এখন নয়, ইন্দিরা গান্ধীর সরকার, জনতা পার্টির সরকার, রাজীব গান্ধীর সরকার, পরে ভি পি সিং-বিজেপি সরকার, নরসিমহা রাও সরকার, কংগ্রেস সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট সরকার, পরে বিজেপি জোট সরকার, আর এখন আবার কংগ্রেস জোট সরকার — বরাবরই সি পি এম তাদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি অনুযায়ী, কোন না কোনও অজুহাত দেখিয়ে প্রতিটি বুর্জোয়া সরকারের সাথে সমঝোতা করে চলেছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

আন্দোলন না করলে চরিত্র-মনুষ্যত্ব থাকে না

পাঁচের পাতার পর

সি পি এমের কর্মসূচি বিশ্লেষণ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগেই নানা আলোচনায় বলেছিলেন, সি পি এমের কর্মসূচি আসলে বিপ্লবী বাগাড়ম্বরের আড়ালে, বুর্জোয়াদের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতায় যাওয়া, এবং কিছু সংস্কারমূলক কাজ করা মাত্র — যার সাথে মার্ক্সবাদের, রাষ্ট্রবিপ্লবের কোন সম্পর্ক নেই। মিলিয়ে দেখুন, কমরেড শিবদাস ঘোষের বিশ্লেষণ কেবল অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে তাই নয়, অধঃপতনের পথে সি পি এম আজ ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলির চাপিয়ে দেওয়া 'উন্নয়ন' ও 'সংস্কার' কর্মসূচি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কার্যকর করার বিনিময়ে রাজ্যের সরকারি ক্ষমতায় থেকে ভোগবিলাসে ডুবে আছে, এখন চেষ্টা করছে বুর্জোয়া কংগ্রেস সরকারের সহযোগী হয়ে কী করে দিল্লিতে বড় শক্তি হয়ে আসা যায়। এই হচ্ছে সি পি এমের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির পরিণতি।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, একথা ঠিক যে, লেনিন শুধু পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের নির্বাচনে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণের কথা বলেছিলেন। বলশেভিক পার্টিও পার্লামেন্টে গিয়েছিল এবং যেসব দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র আছে, সেখানে, এমনকী অবাধ নির্বাচনের মধ্য দিয়েও, বুর্জোয়া ব্যবস্থার স্বার্থই রক্ষা করা হয় একথা জেনেও, জনগণকে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহমুক্ত করতেই বিপ্লবীদের নির্বাচনে যেতে হয় ও যেতে হবে। কিন্তু কোনও একটি রাজ্যে সরকারে যেতে পারলে কমিউনিস্টরা কী করবে — এই প্রশ্নটা, বিশেষ করে আমাদের দেশে উঠল ১৯৫৭ সালে কেরালার নাম্বুদিরিপাদ সরকার যখন শ্রমিক আন্দোলনে গুলি চালিয়ে শ্রমিক হত্যা করেছিল, ঐ সময়ই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেন, একটা বামপন্থী দল যদি সরকারে গিয়ে আইনশৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামকে দমন করে, তাহলে বুর্জোয়া কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায় ? তিনি বললেন, কোনও সময় বামপন্থীরা সুযোগ এলে সরকারে যেতে পারে, কিন্তু তাদের নীতি হবে, বিরোধী দল থাকাকালীন যেভাবে তারা শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে চেয়েছে, সরকারে বসেও সেই একই ভূমিকা পালন করা। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অংশের মানুষের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পুলিশ-প্রশাসনের অত্যাচার ও দমন থেকে মুক্ত রাখা। এটা কার্যকর করতে গিয়ে যদি বুর্জোয়াশ্রেণী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে বিরোধ ঘটে এবং যেটা ঘটতে বাধ্য, তবে জনগণকে সংগঠিত করে তাকেও মোকাবিলা করা — যেটা জনগণকে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহমুক্ত করতেই সাহায্য করবে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের প্রশ্ন আসে, তখন আমাদের দলের এই দৃষ্টিভঙ্গি সি পি এম, সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস ইত্যাদিরা মানতে চায়নি। আমরা যখন বলি, এ নীতি না মানলে আমরা সরকারে যাব না, একমাত্র তখনই তারা মানতে বাধ্য হয়। ঐ সরকারের শ্রমমন্ত্রী হিসাবে বিশিষ্ট জননেতা, আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের গাইডলাইন অনুসরণ করেন। সমগ্র রাজ্যে প্রবল আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়, পথে-ঘাটে আওয়াজ ওঠে — 'যুক্তফ্রন্ট সরকার গণআন্দোলনের হাতিয়ার'। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, গোটা ভারতেই জনগণের সামনে যুক্তফ্রন্ট সরকার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দেখা দেয়। এতেই ভারতের একচেটে পুঁজিপতিদের মধ্যমণি টাটা-বিড়লারা আতঙ্কিত হয়, চাপ সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপালকে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দেয়। সমগ্র রাজ্যে ব্যাপক আন্দোলনের ঝড় ওঠে, আন্দোলনের জোরেই পুনরায় '৬৯ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়ে ফিরে আসে। সেদিন ভোটে জেতার জন্য সি পি এম-কে বুথ দখল ও রিগিংয়ের কথা ভাবতে হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ই মালিকশ্রেণীর চাপে সি পি এম, বাংলা কংগ্রেস ও অন্যান্য দল ষড়যন্ত্র করে পূর্বতন সরকারের সবচেয়ে জনপ্রিয় মন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জীকে শ্রমদপ্তর থেকে সরিয়ে দেয় এবং ধীরে ধীরে সুকৌশলে শ্রমিক আন্দোলন ও গণআন্দোলনের রাশ ভিতর থেকে টেনে ধরতে থাকে। পরবর্তীকালে তারা আমাদের দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

১৯৭৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে দ্বিতীয় বেতার ভাষণে জ্যোতি বসু ঘোষণা করেন, 'এবার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে কোনও আন্দোলন-অশান্তি হবে না ; কারণ যুক্তফ্রন্টে এস ইউ সি আই ছিল, এখন ওরা নেই'। এ কথাগুলি তিনি অবশ্যই মালিকশ্রেণীকে শুনিয়েছিলেন। বুদ্ধদেববাবু সেই ঐতিহ্যই রক্ষা করছেন। এখন শিল্পে শান্তির মানে দাঁড়িয়েছে মালিকের শান্তি — তাদের যথেচ্ছ লুণ্ঠন ও শোষণের হাড়িকাঠে শ্রমিকদের শান্তভাবে মাথা গলিয়ে দেওয়া। স্বয়ং সি পি এমের শ্রমমন্ত্রী বিধানসভায় স্বীকার করেছেন, কলকারখানা বন্ধ হওয়ার জন্য ৯৮ শতাংশ ক্ষেত্রে মালিকরাই দায়ী, মাত্র ২ শতাংশের জন্য শ্রমিক আন্দোলন বা ধর্মঘটকে দায়ী করা যায়। তবুও মুখ্যমন্ত্রী হুমকি দিয়েছেন, 'জঙ্গি' শ্রমিক আন্দোলন চলবে না। অথচ জঙ্গি দূরের কথা, বাস্তবে কোন আন্দোলনই হচ্ছেনা, তার কোমর সিপিএম ভেঙে দিয়েছে। সিপিএম নেতৃত্ব কর্মীদের বোঝায়, আগের মতো আন্দোলন করলে 'বামফ্রন্ট' সরকার থাকবে না, আর সরকার না থাকলে বামপন্থা দুর্বল হবে, সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জোর বাড়বে। অথচ, পশ্চিমবঙ্গে যখন সি পি এম সরকার ছিল না, সরকার হবে বলেও কেউ ভাবেনি, তখন এই রাজ্যে বামপন্থী ও গণআন্দোলনের জোয়ার ছিল, বামপন্থীদের জনগণ শ্রদ্ধার চোখে দেখত। সেদিন এরাজ্যে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পায়ের নীচে জমি খুঁজে পায়নি। অন্যদিকে দীর্ঘদিন সরকার চালিয়ে এখন তারা হাল এমন করেছে যে, মানুষ এখন সিপিএম-কেই অশ্রদ্ধার চোখে দেখে ; মারদাঙ্গা, বুথ দখল, রিগিং, টাকার খেলা বাদ দিয়ে কোন আসনেই সি পি এম এখন লড়াইয়ের কথা ভাবতে পারে না। ওদের এই আচরণ বামপন্থার মর্যাদাকেও জনগণের চোখে যথেষ্ট নামিয়ে দিয়েছে। বামপন্থী আন্দোলন দুর্বল হওয়ার ফলেই সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাভাবনা ইত্যাদি সমাজে খুবই বেড়েছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বুর্জোয়াশ্রেণী ভালই জানে, বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমও বোঝে, সি পি এম কেমন মার্ক্সবাদী ! সেজন্যই তারা অত্যন্ত সুচতুরভাবে সি পি এম-এর সকল জনবিরোধী কার্যকলাপ ও দুর্নীতিকে মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে প্রচারে কাজে লাগাচ্ছে। সি পি এম নেতাদের অনৈতিক আচরণ, জীবনযাত্রাকে দেখিয়ে প্রচার করছে লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং এমনই ছিলেন ; মার্ক্সবাদীরা এ'রকমই হয়। অথচ আমরা তো জানি, এগুলো কত বড় মিথ্যাচার ! তিনি বলেন, সি পি এম-কে দেখিয়ে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে বুর্জোয়াদের এই কুৎসা প্রচারে বিভ্রান্ত হলে শোষিতশ্রেণীর সর্বনাশ হবে। কারণ, মার্ক্সবাদ ছাড়া আজকের দিনে শোষণ থেকে মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। মার্ক্সবাদকে বর্জন করা মানে মুক্তি আন্দোলনকে, বিজ্ঞানকে বর্জন করা। রাশিয়ায়, চীনে সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে মানেই মার্ক্সবাদ ব্যর্থ, সমাজতন্ত্র ব্যর্থ — একথা প্রমাণ হয় না। যেমন কোনও চিকিৎসক ভুল করলে চিকিৎসাবিজ্ঞান ভুল প্রমাণ হয় না। মার্ক্সবাদ হচ্ছে বিজ্ঞান। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিইচ্ছা বা কল্পনার ভিত্তিতে মার্ক্সবাদ আসেনি, মার্ক্সবাদ এসেছে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত ও প্রমাণিত সত্যকে আধার করে মানবজাতির প্রয়োজনে, সমাজবিকাশের প্রয়োজনে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বস্তুর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে, আর মার্ক্সবাদ, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার বিশেষ সত্যগুলিকে সাধারণীকরণের মধ্য দিয়ে সাধারণ সত্য বের করেছে। তাই বিজ্ঞানের যেমন ধ্বংস নেই, তেমনি মার্ক্সবাদেরও ধ্বংস হতে পারে না। বুর্জোয়ারা মুনাফার স্বার্থে কলকারখানা-কৃষিতে উৎপাদনের জন্য, ওষুধ তৈরির জন্য ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বটানি নেবে ; মহাকাশে রকেট পাঠাবার জন্য, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের জন্য বিজ্ঞানকে নেবে ; কিন্তু সমাজের সমস্যা বিচারের ক্ষেত্রে, তাদের মতে বিজ্ঞান চলবে না। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা বিচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করতে তাদের আপত্তি। আসলে, সমাজের সমস্যা বিচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে মানলে বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়। অথচ, আমরা মার্ক্সবাদীরা বলি, সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান চাই।

যারা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতাকেই বড় করে দেখাচ্ছে, তাদের জেনে রাখা দরকার, এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাস্তবে ইতিহাসের কয়েক হাজার বছরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম — অর্থাৎ, দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ — গোটা শ্রেণীশোষণ পর্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সেই অর্থে সমাজতন্ত্রের সত্তর-আশি বছরের সংগ্রামের ইতিহাস কি বিরাট কিছু ? ইউরোপে নবজাগরণ থেকে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বুর্জোয়াদের চারশ' বছর লেগেছিল। লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং, কমরেড শিবদাস ঘোষ সকলেই বারবার বলেছেন, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে পৌঁছানোর দীর্ঘ পরিক্রমায় সমাজতন্ত্র একটি অন্তর্বর্তী স্তর। সঠিক নেতৃত্বে পরিচালিত হলে সমাজ সাম্যবাদের দিকে এগোবে, ভুল নেতৃত্ব হলে পুনরায় পুঁজিবাদ ফিরে আসবে। মৃত্যুর আগে মহান নেতা স্ট্যালিন সোভিয়েটে সমাজতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, মহান নেতা মাও সে-তুং চীনে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, কীভাবে সোভিয়েট পার্টিতে নেতা-কর্মীদের চেতনার নিম্নমান থাকার ফলে সংশোধনবাদী নেতৃত্বের পক্ষে সমাজতন্ত্রকে দুর্বল ও খতম করা সম্ভব হল। ফলে, সমাজবিকাশের লড়াইয়ের আদর্শ ও পথনির্দেশ আছে, যা আমাদের আরত্ত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আরও শক্তিশালীভাবে দাঁড়াতে পারে।

তিনি বলেন, ভারতবর্ষের মাটিতে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার লক্ষ্য নিয়েই এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, আজও আমরা সেই লক্ষ্যেই অবিচল থেকে লড়াই করে যাচ্ছি। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে, এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য সহযোদ্ধা ও অনুগামী কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে আমাদের দল ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনের সামনে আমাদের দুটি লক্ষ্য থাকে। একদিকে দাবি আদায় করা, আবার দাবি যদি আদায় না-ও হয়, তবুও আমরা আন্দোলন করি ও করে যাব। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করলে, লড়াই না করলে চরিত্র থাকে না, মনুষ্যত্ব থাকে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ব্যক্তি হিসাবে তুমি যদি কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পার, তবে তুমি মানুষ হওয়ার যোগ্য নও। সমাজে প্রতিবাদ ও আন্দোলন না থাকলে অত্যাচারী শাসক আরও বেপরোয়া হয়ে যায়। আবার গণতান্ত্রিক দাবি নিয়ে এই লড়াই-আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে মূল বিপ্লবী আন্দোলন — যেটা না হলে সমস্যার মৌলিক সমাধান নেই, তার প্রস্তুতি গড়ে তোলাও আমাদের লক্ষ্য। গণআন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সেই প্রস্তুতি গড়ে তুলে আমরা পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। এ লড়াই কেবলমাত্র আমাদের দলের কর্মীদের দ্বারা গড়ে তোলা সম্ভব নয়, দেশের ব্যাপক জনগণকে এই লড়াইয়ে চাই। লড়াই ছাড়া বিপ্লবী চেতনা অটুট রাখা, সংগ্রামী মনোবল অর্জন করা ও জনতার সংঘবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। চূড়ান্ত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব হচ্ছে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি। এজন্য অসংখ্য ছাত্র-যুবক ভলান্টিয়ার দরকার, সর্বত্র জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে গণকমিটি গড়ে তোলা দরকার।

জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এই লড়াই শুধু একা পার্টির লড়াই নয়, জনগণের লড়াই। জনগণকে এই লড়াইয়ের দায়িত্ব নিতে হবে। শুধু চাঁদা, শুধু সমর্থন ও শুভেচ্ছা দিয়ে চলবে না ; এই লড়াইতে জনগণকে সামিল হতে হবে, ঘরের ছেলেমেয়েকে এগিয়ে দিতে হবে। ঘর থেকে একটি দু'টি ছেলেমেয়ে দিন, তারা পরিবারে হয়তো টাকা রোজগার করে আনবে না, কিন্তু আনবে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে মনুষ্যত্বের আলো, যারা বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে, পরিবারে বিবেককে জাগিয়ে রাখবে। এমন ছেলেমেয়ে এই দলে তৈরি হচ্ছে, হবে। দরকার এমন অসংখ্য সাহসী ছাত্র-যুব ভলান্টিয়ার, যারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় নিজেদের গড়ে তুলে বিপ্লবের জন্য, শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য, মুক্ত সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্য জীবনের সর্বস্ব দেবে।

এই আহ্বান জানিয়েই কমরেড প্রভাস ঘোষ বক্তব্য শেষ করেন।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের পর সভা শেষ হয়।

জীবনশৈলী শিক্ষা

একের পাতার পর

প্রয়োজন ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব সমস্যা বর্তমান তা নিরসনের জন্য চেষ্টা করা — ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষার ফি কমানো, বইখাতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য হ্রাস করা, বিদ্যালয়গুলিতে শূন্য শিক্ষক পদ পূরণ করা ইত্যাদি সরবরাহ করা, সেখানে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী চক্রান্তের সাথে হাত মিলিয়ে এদেশের পুঁজিবাদের সেবায় নিয়োজিত সরকারগুলি মানুষ হবার সমস্ত প্রক্রিয়া কিশোর-কিশোরীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, এইড্স প্রতিরোধের নামে এদেশে এইড্স সংক্রান্ত পণ্যের বাজার সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে উন্মুক্ত করে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং বাম নামধারী সিপিএম সরকার এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। আমরা এই পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই পরিকল্পনা সফল হলে ভবিষ্যত প্রজন্ম নীতি-নৈতিকতা বর্জিত মেরুদণ্ডহীন প্রাণীতে পরিণত হবে।

তথাকথিত জীবনশৈলী পাঠক্রম বাতিল সহ অন্যান্য দাবিগুলির বিষয়ে সংগঠনের লিখিত বক্তব্য পর্ষদ সভাপতির কাছে পেশ করা হয়েছে।

আট ঘন্টা শ্রমদিবসের দাবি আজও প্রাসঙ্গিক

একের পাতার পর

চটকলের মজুর মালিকের নির্ধারিত উৎপাদন একা করতে না পেরে নিজের মজুরির ভাগ দিয়ে আর একজনকে নিয়োগ করছে 'ভাগাওয়ালা' হিসাবে। একজনের মজুরিতে মালিক খাটাচ্ছে দু'জনকে। ব্যাঙ্কে বসছে কম্পিউটার, কমছে কর্মচারী, বাড়ছে খাটুনির প্রবল চাপ। নিজের এবং পরিবারের পেট চালাতে শ্রমিক-কর্মচারী খেটে চলেছে অবিরাম। আজকের কারখানায়, কল সেন্টারে ঢোকার নির্দিষ্ট সময় আছে, কিন্তু ছুটির ঘণ্টা নেই।

কেন উঠেছিল আট ঘন্টার শ্রমদিবসের দাবি? কী যুক্তি ছিল এর পিছনে? যুক্তি ছিল — শ্রমিকও মানুষ, তাকে মানুষের মতো বাঁচতে দিতে হবে দেহে মনে। তার মানবিক বৃত্তির চর্চা, সামাজিক জীবনযাপন, বৌদ্ধিক বিকাশ — এক কথায় তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য তাকে সময় দিতে হবে। তাই আট ঘন্টা শ্রম বেঁচে থাকার খাদ্য সংগ্রহের জন্য, আট ঘন্টা অবসর মানবিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য, আট ঘন্টা দেহমনের বিশ্রাম ও নিদ্রা — এই দাবি তুলেছিল সভ্যতার স্রষ্টা শ্রমিক।

দাস যুগে দাসদের খাটানো হতো চব্বিশ ঘন্টা। তাদের অমানুষিক শ্রম লুণ্ঠন করে দাসপ্রভুর অবসর জুটতো, দাসপ্রভুদের পৃষ্ঠপোষক সংস্কৃতিপ্রেমী উপরতলার মানুষেরা বৌদ্ধিক চর্চার অবকাশ পেত। সামন্তীযুগের চেহারাও প্রায় অনুরূপ। ভূমিদাস আর লাঙলটানা পশুর জীবনে পার্থক্য প্রায় ছিল না। শিল্পবিপ্লব নিয়ে এল পুঁজিবাদ। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। এই পরিস্থিতি অতীতে কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু শ্রমের এই বহুগুণ বর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতার সুফল কে নেবে? পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এর সমস্ত সুফল কুক্ষিগত করল মালিক পুঁজিপতিশ্রেণী। মালিক চায় আরও মুনাফা, সেজন্য সে চায় আরও দীর্ঘ শ্রমদিবস, নিত্যনতুন যন্ত্র বসিয়ে শ্রমিকের কর্মক্ষমতাকে নিংড়ে নিতে চায় মালিক। শ্রমিক চায় তার শ্রমের ফসল — শুধু বাঁচার মতো মজুরি নয়, চায় মানুষের মতো জীবনধারণ। মে দিবসের ৩৮ বছর আগে ১৮৪৮ সালেই কার্ল মার্কস পুঁজিবাদের শোষণমূলক বর্বর চরিত্রকে নগ্ন করে দিয়েছেন। মিথ্যার জাল ছিঁড়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, মালিকের মুনাফার আসল ও একমাত্র উৎস হল শ্রমিকের শ্রম। মালিক চায় শ্রমের ফসল থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত করে যত বেশি সম্ভব তাকে খাটিয়ে মুনাফা লুঠতে। যত ঘণ্টা শ্রমিক খাটে, বা মালিক তাকে খাটাতে পারে, তত মালিকের মুনাফা বাড়ে। বাড়তি শ্রমের জন্য বাড়তি শ্রমের পূর্ণ মূল্যও মালিক দেয় না। আঠারো ঘণ্টা খেটে শ্রমিক যখন বেরিয়ে আসে, তখন তার দেহ ক্লান্ত, মন অসাড়। অশিক্ষিত শ্রমিক যায় শুঁড়িখানায়, জুয়ার আড্ডায়, অতিরিক্ত শ্রমের ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে; শিক্ষিত শ্রমিক যায় বারে, ডিসকোথেকে, ক্যাসিনোয়। সেখানে শ্রমিক আর মানুষ থাকে না। তাহলে কার স্বার্থে সভ্যতার এই জৌলুষ? বিশ্বজোড়া এই ''উন্নয়ন'', কম্পিউটার, সেল ফোন — যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে শুধুমাত্র দেহের রসদ যোগাড়ের বাইরে যেতে দিতে না পারে, তবে কীসের উন্নয়ন! বেশি খাদ্য, ভালো খাদ্যের জন্য তো পশুও ছোটে। সেটা কি মানুষের আদর্শ? মে-দিবস বলছে, না।

মে দিবসের আট ঘন্টার শ্রমদিবসের দাবি শুধু অর্থনৈতিক দাবি নয়। এই লড়াই শ্রেণী- সংগ্রামেরই প্রকাশ এবং এর ধারায় পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার এবং শোষণ থেকে শ্রম ও শ্রমিককে মুক্ত করে জীবনের সার্বিক বিকাশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সামনে প্রকৃত মানুষের মত বাঁচার পথ খুলে দেওয়াই যে এর চূড়ান্ত লক্ষ্য, তা নির্দেশ করেন মার্কসবাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা মহান এঙ্গেলস। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দেন লেনিন। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া উৎপাদন থেকে ব্যক্তিমুনাফার উচ্ছেদ ঘটায় এবং শ্রমিকের জীবন আমূল বদলে দেয়। কারখানাগুলি হয়ে ওঠে শ্রমিকের জীবনের অঙ্গ। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় কারখানাকে কেন্দ্র করে সঙ্গীত গোষ্ঠী, নাট্য দল, শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা সভা গড়ে ওঠে। ত্রিশের দশকে স্ট্যালিনের রাশিয়ায় সপ্তাহান্তে ১ দিন ছুটির বদলে চারটি কর্মদিবসের পর একদিন ছুটি চালু হয়। এই দশকেই রাশিয়ায় গিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, তাদের সংস্কৃতি চর্চার আগ্রহ ও সেজন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কারখানার মজুর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আধুনিক চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী দেখছে, কিংবা সেক্সপীয়রের নাটক দেখছে — এই ঘটনা তাঁকে অভিভূত করেছিল। মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে আমূল বদলে গিয়েছিল চীনের শ্রমিক-চাষীর জীবন। আফিংখোর মাদকাসক্ত হিসাবে কুখ্যাত চীনের মানুষ, নতুন মানুষে পরিবর্তিত হয়েছিল। পুরানো চীন থেকে বেরিয়ে এসেছিল নয়া চীন, নতুন সভ্যতা। শুঁড়িখানার ক্লেদাক্ত পরিবেশ, গণিকালয়ের লজ্জা নির্মূল করেছিল সমাজতন্ত্র। এ ইতিহাসের সত্য, বুর্জোয়ারা কুৎসা ও মিথ্যা কলঙ্কের স্রোত বইয়েও একে চাপা দিতে পারে না।

আজ পুঁজিবাদী দুনিয়া জুড়ে যে ''উন্নয়নের'' প্রচার দু-বেলা চলছে, সে উন্নয়ন কী দিচ্ছে শ্রমিককে? মালিক এসে বলছে — বেতন আরও কমাবো, কাজের ঘণ্টা বাড়াবো। শাসক দলের শ্রমিক ইউনিয়ন লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে বলছে — এটাই বাস্তবতা, একে মেনে নাও। ধর্মঘট কোরো না, করলেও বুঝে শুনে করো। একথাও ইতিহাসে নতুন নয়। মে-দিবসের লড়াইয়ের কালেও মালিকের দালাল শ্রমিকনেতারা ছিল। তারা বলত — ধর্মঘট কোরো না, করতে হলে রবিবার করো। এমনকী তারা বলতো, মে-দিবসটি কাজের দিনে পড়লে সেদিন কর্মবিরতি না করে পরবর্তী রবিবার মে দিবস পালন করো। এদের অশুভ প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল বলেই শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেও কিছু অধিকার অর্জন করতে পেরেছিল, তারপর সঠিক মার্কসবাদী আদর্শ, সঠিক দল চিনে নিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে মুক্তির দরজায় পৌঁছেছিল। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের ভেতর পুঁজিবাদী ভাবনা-ধারণা সংশোধনবাদের আকারে দেখা দিয়ে সমাজতন্ত্রকে বিকৃত করে দেয়। এই ধারাতেই আসে প্রতিবিপ্লব, যা সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে মালিকশ্রেণীর বেপরোয়া শোষণের ও আক্রমণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার বিষময় ফল আজ মেহনতি মানুষের জীবনে বর্তাচ্ছে।

আজ পুঁজিবাদ শ্রমিককে কেবল মে-দিবসের অর্জিত আট ঘণ্টার শ্রমদিবসের অধিকার থেকেই বঞ্চিত করছে তাই নয়, মে-দিবসের শ্রেণীচেতনা থেকেও বঞ্চিত করছে। মালিকী শোষণ মেনে নিয়ে, এই ব্যবস্থার মধ্যেই, প্রয়োজনে অপরকে বঞ্চিত করে হলেও, ষোল-আঠারো ঘণ্টা খেটে হলেও, নিজের প্রাণধারণের রসদ যোগাড় করা এবং উত্তেজক বিনোদনকেই সংস্কৃতি বলে গ্রহণ করাকেই জীবনের সার্থকতা বলে ভাবতে শেখাচ্ছে। শুধু শিক্ষাবঞ্চিত মজুরদেরই নয়; স্কুলে, কলেজে, কারিগরি বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীদেরও বাস্তবতার নামে বিপ্লবী বাস্তবতাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে পুঁজিবাদ ও তার রাজনৈতিক তল্পিবাহকরা। কেবল বর্তমান অবস্থাটাই বাস্তব নয়, এর অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনটাও বাস্তব; কেবল মালিকী আক্রমণটাই বাস্তব নয়, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তিটাও যে বাস্তব, তাকেই বুর্জোয়ারা

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে এবছর ১ মে পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের ইউক্রেনে স্ট্যালিনের প্রতিকৃতি নিয়ে মিছিল। মিছিলে আওয়াজ ওঠে মে দিবসের সংহতি জাগিয়ে তোল।

ও মেকি সমাজতন্ত্রীরা এখন ভুলিয়ে দিতে চাইছে।

১৮৮৬ সালের মে দিবসের আগে ও পরে দীর্ঘদিন শ্রমিকশ্রেণী যখন বুর্জোয়াশ্রেণী, বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তি, পুলিশ-মিলিটারি-বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুঃসাহসী, জঙ্গি লড়াই লড়েছিল তখন শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন হিসাবে মার্কসবাদের আবির্ভাব ঘটলেও বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের সামনে তা অবিসংবাদী মুক্তির দর্শন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠত্ব তখনও প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মে দিবসের লড়াইও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে ওঠেনি। তার নেতৃত্ব মার্কসবাদী দর্শনের দ্বারা পরিচালিত ছিল না। তবুও এই সংগ্রামগুলি বাঁচার লড়াই হিসাবে শ্রেণীসংগ্রামের অমোঘ সামাজিক নিয়মেই গড়ে উঠেছিল। বুর্জোয়ারা বলত, এসব লড়াই সমাজতন্ত্রী বা মার্কসবাদীদের ''চক্রান্তের'' ফল। কিন্তু বাস্তবে এগুলি ছিল বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যেই বুর্জোয়া শাসন-শোষণের বিরুদ্ধশক্তির অনিবার্য উত্থান ও দুই বিপরীত শক্তির সংঘাত। মার্কস এই শ্রেণী-সংগ্রামগুলির যুক্তিসম্মত পরিণতি নির্দেশ করে দেখান শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন ভূমিকার মধ্য দিয়ে সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথে সমাজ শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছবে। ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনের লড়াইয়ের সামনেও মার্কসের সর্বহারা বিপ্লবী আদর্শ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ছিল না। তবুও অভ্যুত্থান হয়েছিল। সেটা ব্যর্থ হওয়ায় মার্কস-এঙ্গেলস সেখান থেকে একটি যুগান্তকারী শিক্ষা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সামনে তুলে ধরে দেখান, পুরানো বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উচ্ছেদ না করে শ্রমিকদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

মে দিবস দেখিয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের চরিত্র আন্তর্জাতিক, বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েটের লড়াইয়ে আপসের কোন স্থান নেই। লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সকলেই কি তা বুঝতে পেরেছিল? না, তা পারেনি। মে দিবসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন এঙ্গেলস, বুঝেছিলেন লেনিন, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত বিপ্লবী নেতৃত্ব। আপসকামীরা বুঝেছিল — এ লড়াই অপরিসীম শ্রমের যন্ত্রণাকে কিছুটা লঘু করার লড়াই, বুর্জোয়াদের সঙ্গে তা নিয়ে দর কষাকষির বেশি কিছু নয়। এঙ্গেলস দেখেছিলেন, মে দিবসের লড়াই হল ইতিহাস বদলানোর অপরাজেয় সামাজিক শক্তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থান। সেদিন বিশ্বে কোথাও বিদ্যমান-বাস্তবে সমাজতন্ত্র ছিল না। শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্য পরিণতিতে ভবিষ্যৎ-বাস্তবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যটি শ্রমিকশ্রেণীর সামনে তুলে ধরেছিল বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বিপ্লবী নেতৃত্ব। অর্থাৎ, সংগ্রামের আশু দাবিদাওয়ার সাথে তার রাজনৈতিক লক্ষ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরে শ্রমিককে সমাজবিপ্লবের সৈনিকে পরিণত করেছিল সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব। বুর্জোয়া সমাজের মধ্যেই কোনমতে মাথা গুঁজে বাঁচার গ্লানি থেকে মুক্ত করে শ্রমিককে মর্যাদাময় বিপ্লবী জীবনের সন্ধানও দিয়েছিলেন তাঁরাই।

আজ, সংশোধনবাদ ও প্রতি বিপ্লবের আঘাতে বিশ্বসমাজতান্ত্রিক শিবির অবলুপ্ত হয়েছে, বুর্জোয়ারা সেটুকু অর্থে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রযাত্রাকে সাময়িকভাবে শ্লথ করতে সক্ষম হয়েছে। আবার এও সত্য, সংশোধনবাদী-আপসকামীদের মুখোশও খুলে গিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতিতে তারা তাদের সঠিক জায়গায়, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণের আঘাতে জর্জরিত শ্রমিকশ্রেণী দেশে দেশে আবার সংগ্রামে নেমেছে। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ যে মানবিকতার মুখোশ পরেছিল তা খসে পড়েছে। আবার শ্রমিক ও মেহনতি জনগণ জাগছে, লড়ছে। এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকার দেশে দেশে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাড়ছে। খোদ আমেরিকায় মে দিবসের সংগ্রামে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠার আওয়াজ উঠছে। পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণও পুঁজিবাদী শাসনের চেহারা টের পেয়ে আবার বলছে, সমাজতন্ত্র চাই, স্ট্যালিনের মতো নেতা চাই। ইতিহাস বলছে — এ না হয়ে পারে না। মার্কসবাদ বলছে — শ্রেণীসংগ্রাম কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় গড়ে ওঠে না। এটা সামাজিক সত্য, কেউ তাকে রুদ্ধ করতে পারে না। কিন্তু সংগ্রামের সামনে চাই জ্ঞানের আলো, যা দিয়েছে মার্কসবাদ, যা পথ দেখাবে। চাই দৃঢ়প্রত্যয়, যা দিয়েছে মার্কসবাদ, যা তেজ জোগাবে। চাই বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি, যা দিয়েছে মার্কসবাদ, যা দুনিয়াকে বদলাবে। উন্নততর জ্ঞান, অধিকতর তেজ, আরও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোতে হবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রামে। এই লক্ষ্য থেকেই দেশে দেশে আপসকামী, ছদ্মবেশী তথাকথিত শ্রমিকদরদীদের বিচ্ছিন্ন করে লড়াই গড়ে তুলতে হবে। মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুংয়ের সুযোগ্য উত্তরসাধক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদের উন্নততর উপলব্ধি, মহত্তর বিপ্লবী চেতনা ও নৈতিকতার সন্ধান দিয়েছেন, এর সঙ্গে চাই জনগণের সক্রিয় শক্তি। বিপ্লবী জ্ঞানের সঙ্গে বিপ্লবী শক্তির মেলবন্ধন ঘটানোর আহ্বান নিয়ে এসেছে এবারের মে দিবস।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

মে দিবসে বাংলাদেশে সমাবেশ ও গণমিছিল

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে ১ মে গণমুক্তি ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা সম্মিলিত আন্দোলনের উদ্যোগে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ শেষে একটি গণমিছিল বের হয়। মে দিবসের প্রতীক লাল পতাকা ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বিষয়ক নানা স্লোগান নিয়ে শত শত নারী-পুরুষ গণমিছিলে অংশগ্রহণ করে।

লোডশেডিং বন্ধে ৮৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে

— অ্যাবেকা

লোডশেডিং-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস গত ২৬ এপ্রিল নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ-

"আমরা মনে করি, সি ই এস সি এবং পি ডি সি এল-এর উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী ৮৫ শতাংশ উৎপাদন না করার ফলেই 'পিক আওয়ারে' ঘাটতি দেখা দিচ্ছে এবং কলকাতা সহ রাজ্যব্যাপী ধারাবাহিকভাবে লোডশেডিং চলছে। একাজ করা হচ্ছে সি ই এস সি এবং পি ডি সি এল তথা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ব্যবসায়িক স্বার্থে। রাজ্য সরকার ও রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের একথা খুব ভাল করে জানা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে তারা সত্য গোপন করে চলেছে।

"আমরা অবিলম্বে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ৮৫ শতাংশ উৎপাদন না হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং লোডশেডিং-এর জন্য গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকার ও রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে দাবি জানাচ্ছি।"

এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত

তিনের পাতার পর

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন উদ্যোক্তারা। সভায় 'গণআন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে' মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণের অংশবিশেষ পড়ে শোনানো হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষে কমরেড মহীউদ্দিন শেখ বলেন, ভোটের জন্য এই পার্টি তৈরি করেননি কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি এই দলটি গরিব চাষী-মজুরের শোষণমুক্তির জন্য তৈরি করেছেন। পার্টি প্রতিষ্ঠা দিবসে উপস্থিত কমরেডরা খুব শীঘ্র দলের শিক্ষাশিবির করার এবং সারা দ্বীপপুঞ্জে মহান নেতার চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেবার শপথ নেন।

ঘাটশিলা

ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে আমাদের প্রিয় দল এস ইউ সি আই-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। সকাল ৯টায় রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদানের পর তাঁর উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড সৌমেন বসু এবং সভাপতি ছিলেন কমরেড মলয় বোস।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রিয় নেতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী দলের সমস্ত নেতা ও কর্মীর উদ্দেশে যে আহ্বান রেখেছেন সভায় তা পড়ে শোনানো হয়। কমরেড সৌমেন বসু তাঁর ভাষণে বলেন, আজ আমাদের প্রিয় দলের ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এর মধ্যে দল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও ব্যাপ্তি লাভ করেছে। আজকে দলের কর্মীদের সমস্ত প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে আসার সময়। তিনি সেন্টারের কমরেডদের উন্নত চারিত্রিক দৃঢ়তা গড়ে তোলার সংগ্রামে লিপ্ত থাকার আহ্বান জানান।

মধ্যপ্রদেশ

জবলপুরের কাঁচঘর চকে এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবসে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির জবলপুর জেলা সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড ভবানী ঘোষ বলেন, আজ যখন সমস্ত নামী-দামী দলগুলি পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবায় মত্ত, তখন জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র এস ইউ সি আই-ই লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সভার প্রধান বক্তা, দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ইনচার্জ কমরেড উমাপ্রসাদ বলেন, বিগত ৫৮ বছর ধরে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি জনগণকে বিভ্রান্ত করে ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবদের আরও গরিব করেছে। এদেশের একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড প্রদীপ চৌধুরী। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

ঝাড়খণ্ড

ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাজধানী রাঁচীতে ২৪ এপ্রিল পার্টির ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কেন্দ্রীয়ভাবে পালিত হয়।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে দলের শত শত কর্মী-সমর্থক-দরদীরা ২৪ এপ্রিলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রবল উত্তাপ, দেরি করে পৌঁছানো ট্রেনের ধকল উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশে যোগ দেন। দুপুরে রাঁচী স্টেশন থেকে ফেস্টুন-ব্যানার-প্ল্যাকার্ডে সুসজ্জিত, ২৪ এপ্রিলের সমাবেশের আহ্বান এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে স্লোগান মুখরিত এক বিশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে জয়পাল সিং স্টেডিয়াম ময়দানে পৌঁছায়। ময়দানে পার্টির একটি বুকস্টল খোলা হয়। বহু সাধারণ মানুষ ও কমরেড তাদের প্রয়োজনীয় বই স্টল থেকে সংগ্রহ করেন। বিকালে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ওপর রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। এরপর দলের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মহান নেতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'গার্ড অব অনার' প্রদর্শন করেন।

সভার মূল বক্তা ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি তাঁর বক্তব্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির ওপর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। বিশেষ করে আলোচনায় তিনি পুঁজিবাদের বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতি এবং সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, এই লক্ষ্যকে পূরণ করতে হলে ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই'র পতাকাতলে সমবেত হয়ে দলকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

সভার সভাপতি কমরেড হেম চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে ভ্যাট এবং পেটেন্ট আইন সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেডস্ কে পি সিং ও সীতারাম টুডু।

গুজরাটের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড ছায়া মুখার্জী

ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিজয়ের ৬০তম বার্ষিকীতে

এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে

সমাবেশ

৮ মে, বিকাল ৫টা

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম

অবিলম্বে ভ্যাট প্রত্যাহার করতে হবে

— এস ইউ সি আই

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৯ এপ্রিল, ২০০৫ এক বিবৃতিতে বলেন—

"ভ্যাট চালুর ফলে ব্যাপকভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা ধ্বংস হবে এবং একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলি লাভবান হবে। ফলে 'ভ্যাট' প্রত্যাহারের দাবিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা যে আন্দোলন করছেন তাকে আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করছি এবং অবিলম্বে 'ভ্যাট' প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।"

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in